[এমবার্গোঃ **23** আগস্ট **2005]** পাবলিক

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

বাংলাদেশের

মানবাধিকার রক্ষাকারী কর্মীরা আক্রমণের সম্মুখীন

AI Index: ASA 13/004/2005

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM

সূচিপত্র

1. ভূমিকা 1
2. রাজনৈতিক মেরুকরণ 3
   2.1 সশস্ত্র সহিংসতার সংস্কৃতি 4
   2.2 ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মধ্যে উত্তেজনা 5
   2.3 উদারপন্থীদের অবস্থান আক্রমণের সম্মুখীন 6
   2.4 এনজিওদের লক্ষ্যবস্তু করা 7
3. লঙ্ঘন ও সেগুলির কারণ 12
   3.1 ইচ্ছামতো গ্রেফতার ও নির্যাতন 13
   3.2 বাঁচার অধিকার ও ব্যক্তির নিরাপত্তার লঙ্ঘন 16
4. অব্যাহতি, দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলি ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠির সেগুলি নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার 17
5. উপযুক্ত সতর্কতা 18
6. আইনগত কাঠামো 22
7. **এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সুপারিশ** 23
   7.1 আইন বলবৎকারী কর্মচারীদের ইচ্ছামতো গ্রেফতার, ইচ্ছামতো আটক ও নির্যাতন করার বিষয়ে 23
   7.2 রাষ্ট্রযন্ত্র–বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থারা যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়, আক্রমণ ও গুপ্তহত্যা করে সেবিষয়ে 24
   7.3 মানবাধিকার সুরক্ষার রক্ষাকবচগুলি জোরদার করার বিষয়ে 24
   7.4 শাসক জোটের সদস্যদের সংঘটিত অনাচার-অত্যাচার সম্পর্কে 24
   7.5 রাজনৈতিক দলগুলির জন্য সুপারিশ 25
   7.6 আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য সুপারিশ 25
   7.7 প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের জন্য সুপারিশ 25

বাংলাদেশ
মানবাধিকার রক্ষাকারী কর্মীরা আক্রমণের সম্মুখীন

"অনেক হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হচ্ছে। ওদের উপর অনেক চাপ রয়েছে স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে যাদের সঙ্গে এমন উঁচুপর্যায়ের কর্তৃপক্ষের সংযোগ আছে যারা চান সাংবাদিকেরা যেন মুখ বন্ধ রাখেন। "[1]

1. ভূমিকা

বাংলাদেশে একের পর এক সরকারের আমলে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনাচার-অত্যাচার ঘটেছে। এই রিপোর্টে বর্তমান ও বিগত সরকারদের আমলের ঐসব ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেগুলির মধ্যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা এবং তাদের বিরুদ্ধে অনাচার-অত্যাচার নিবারণে রাষ্ট্রের পদ্ধতিগত ব্যর্থতা দেখা যায়।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকারের সুরক্ষা ও বিকাশ নিশ্চিত করতে সকল সরকারকে দায়িত্বশীল বলে বিবেচনা করে থাকে। একই ভাবে, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সাধারণভাবে মানবাধিকারকে ক্রমাগতভাবে অগ্রাহ্য করার একটা চক্র এবং সুনির্দিষ্টভাবে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে অনাচার-অত্যাচারের অবসান ঘটানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ক্রমাগতভাবে অব্যাহতি, যা কয়েক দশক আগে ঐদেশের জন্ম হওয়ার পর থেকে বিরাজ করছে , সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মোকাবেলা দরকার ।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই লক্ষ্য পূরণের দিকে সক্রিয় সমর্থন দেওয়ার জন্য ঐদেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধি, যেমন পুলিশ, সেনাবাহিনি ও আইনরক্ষাকারী কর্মকর্তা, যাদের জন্য বাংলাদেশের একের পর এক সরকারের সরাসরি জবাবদিহিতা রয়েছে, তারা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে কতগুলি লঙ্ঘনের জন্য দায়ী। এসব লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে গ্রেফতার ও নির্যাতন। এছাড়া ওগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ,মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে, বাহ্যতঃ অপ্রমাণিত ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের ,একের পর এক মামলা ফাইল করে,অব্যাহত হয়রানি। যেসব বেসরকারী সংস্থা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে তাদের আমলের শাসক সরকারের থেকে আলাদা অবস্থান বজায় রাখতে চেয়েছে তাদেরও প্রায়সময়েই হয়রানি করা হয়েছে।

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে অনাচার-অত্যাচারের অন্যান্য সংঘটনকারীরা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠি যাদের সঙ্গে সশস্ত্র অপরাধী গুন্ডাদলের যোগসূত্র আছে, শাসক জোটের কিংবা বিরোধীপক্ষের দলগুলি , অথবা ভাড়াটে গুন্ডাদল যাদেরকে স্থানীয় রাজনীতিকেরা তাদের বে-আইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্ঘাটন চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভাড়া করেন বলে অভিযোগ। এসব 'রাষ্ট্রযন্ত্র-বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থার সংঘটিত অনাচার অত্যাচারের মধ্যে রয়েছে, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রাণনাশের হুমকি এবং দৈহিক আক্রমণ।

শয়ে শয়ে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন। ওদের মধ্যে অনেকের উপর হামলাও হয়েছে। অনেকে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এবং কারুর কারুর অব্যাহতভাবে চিকিৎসার দরকার। কয়েকজন সাংবাদিক যারা মানবাধিকার রক্ষার কাজে জড়িত ছিলেন তাদের আঙ্গুল বা হাত ইচ্ছা করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে,

[1] বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার কর্মীর মতামত।

যাতে করে তারা আর কলম ধরতে না পারেন। অব্যাহত হুমকির মুখে তাদের অনেককেই নিজেদের বাড়ী ও এলাকা ছেড়ে যেতে হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত, কমপক্ষে আটজন মানবাধিকার রক্ষাকারী কর্মীকে গুপ্তঘাতকেরা হত্যা করেছে ,যাদের সাথে সশস্ত্র অপরাধী গুন্ডাদল কিংবা রাজনৈতিক দলগুলির সশস্ত্র গোষ্ঠির যোগসুত্র আছে বলে ধারণা করা হয় ।

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন ঐসব নারী ও পুরুষ যারা নিজে থেকে কিংবা যৌথভাবে মানবাধিকারের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য কাজ করে থাকেন। মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানগুলি থেকে তাদের কাজের অনুপ্রেরণা পান। এসব কাজের মধ্যে আছে, কিন্তু যেগুলির মধ্যেই কেবল সীমিত নয়, সেগুলি হচ্ছেঃ সত্য ও ন্যায়বিচারের সন্ধান; আইনের শাসনকে শক্তিশালী করা; সরকারের জবাদিহিতা বাড়ানো; নারীপুরুষ, যৌনাভ্যাস ও বর্ণগত সাম্যের জন্য সংগ্রাম; শিশুদের অধিকার; শরণার্থীদের অধিকার; দুর্নীতি, পরিবেশের অবনতি, ক্ষুধা, রোগ ও দারিদ্রের বিরূদ্ধে সংগ্রাম।

১৯৯৮ সালে, জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অধিকার ও দায়িত্বগুলির স্বীকৃতি দেয় (দেখুন ডিক্লেয়ারেশন অন হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ – প্রস্তাব নম্বর ৫৩/১৪৪, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ (Declaration on Human Rights Defenders – resolution 53/144 of 9 December 1998).)

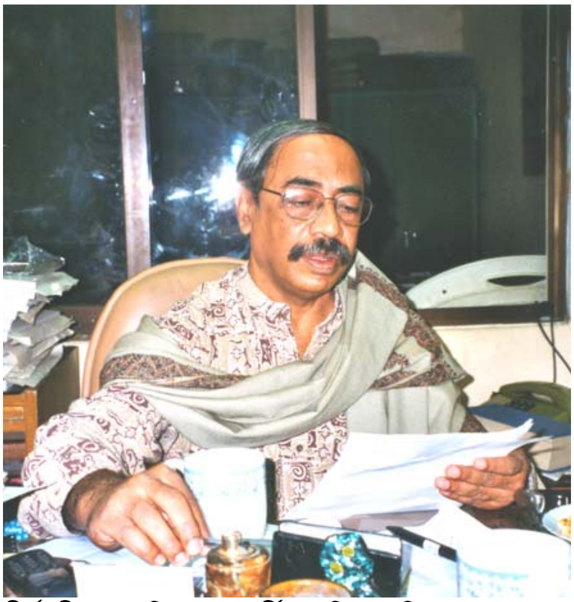

শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, শাহরিয়ার কবির।
©Private

বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মধ্যে আছেন সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষাবিদ, বেসরকারী সংস্থার কর্মচারী, আইনজীবি, এবং পেশাদার সংস্থার সদস্যরা। ওদের মধ্যে রয়েছেন শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক পটভূমির নারী ও পুরুষ।

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা যেসব অনাচার অত্যাচারের সম্মুখীন হন, যে ধরণের কার্যকলাপ তাদের হয় হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন, কিংবা প্রাণনাশের হুমকি বা আক্রমণের ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়, এই রিপোর্টে সেইসব তথ্য দেওয়া হয়েছে। এতে তুলে ধরা হয়েছে এসব লঙ্ঘনের কারণ এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সুপারিশ, যেগুলির বাস্তবায়ন হলে, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা দেবে।

এই রিপোর্টের ভিত্তি হলো প্রধানতঃ ২০০৩ সালের শেষদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানের ২০ জনের বেশী মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার কর্মীর কাছ থেকে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নেওয়া সাক্ষাৎকার , সাংবাদিকদের অবস্থা সম্বন্ধে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি খবরের কাগজে ছাপা রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রকাশনার বিষয়। মার্চ ২০০৫, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই রিপোর্টের খসড়া বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ঢাকায় এক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের দেখিয়েছে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ঐ সেমিনারের অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত ও মন্তব্য, এই রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে, যেসব ব্যক্তি তথ্য দিয়েছেন, তাদের নাম এই রিপোর্টে করা হয়নি।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ৩০শে মার্চ ২০০৫, বাংলাদেশ সরকারের কাছে ঐ খসড়া রিপোর্টের একটা কপি পাঠায় তাদের মন্তব্য জানার জন্য, কিন্তু ২০০৫ সালের জুলাই মাসের শেষ নাগাদও সরকার কোন মন্তব্য এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে পাঠায়নি।

হীরামন মন্ডল, খুলনা ডিভিশনের একজন সাংবাদিক, যিনি স্থানীয় জেলেদের ধরা মাছ সৈন্যদের লুট করে নেওয়ার দুর্দশার বিষয়ে রিপোর্ট করেন, তাকে সৈন্যরা আগস্ট ২০০৩-এ আটক করে গুরুতরভাবে মারধোর করে। ঐ সেনাদলের ক্যাপটেন তার সৈন্যদের বলেন তার আঙ্গুল ভেঙ্গে দিতে। তিনি ডান হাত দিয়ে আর কলম ধরতে পারেন না।

©Private

এই রিপোর্টে উল্লেখিত বেশীর ভাগ ঘটনা সাংবাদিকদের সম্পর্কে। বাংলাদেশী সাংবাদিকেরা প্রায় সময়েই বর্তমান বা অতীত সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কিংবা শাসক সরকারের সদস্যদের সংঘটিত অনাচার-অত্যাচারের ব্যাপারে রিপোর্ট করেছেন এবং সোচ্চার হয়েছেন। যখন মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে তখন তারাই প্রায় সময়ে প্রথম যোগাযোগের ক্ষেত্র, বিশেষ করে এটা প্রযোজ্য প্রত্যন্ত ও গ্রামাঞ্চলে। স্থানীয় লোকজন সাংবাদিকদের এমন মানুষ হিসাবে দেখে থাকেন যারা তাদের কাহিনিগুলি শোনেন এবং তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনাচার-অত্যাচারগুলি ব্যাপকভাবে পাঠক-শ্রোতাদের কাছে ছড়িয়ে দেন।

যেসব এলাকায় এনজিও প্রতিনিধিরা নিরাপত্তার কারণে যেতে পারেন না, সেসব জায়গায় তারা প্রায় একমাত্র সাংবাদিকদের রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করেন। এমনকি এনজিও-রা যখন কোন মানবাধিকার উদ্বেগের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের জন্য তাদের তদন্ত দল পাঠাতে পারে, তখনো তারা নিবিড়ভাবে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে কাজ করে, যাদের কাছে ঐ বিষয়ে সর্বসাম্প্রতিক তথ্য থাকে।

এই রিপোর্টে বিভিন্ন বিপজ্জনক চাপের অবস্থানগুলির একটা বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের তৎপরতা দমন করে থাকে। এসবের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক মেরুকরণের একটা পরিবেশ, বন্দুক সহিংসতার একটা সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মধ্যে উত্তেজনা , এবং একটা সঙ্কুচিত হয়ে আসা উদারপন্থী ক্ষেত্র।

2. রাজনৈতিক মেরুকরণ

মানবাধিকার সংক্রান্ত অনাচার-অত্যাচার দেশে একটা গভীরভাবে নিবদ্ধ রাজনৈতিক মেরুকরণের পটভূমিতে ঘটেছে যা গোটা সমাজকে প্রধানতঃ দুটো রাজনৈতিক দল – বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও আওয়ামী লীগ-এর যে কোন একটির সঙ্গে কিংবা আরো ছোট রাজনৈতিক গোষ্ঠিগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট কতগুলি শিবিরে বিভক্ত করেছে।

এই বিভক্তি, বিভিন্ন পর্যায়ে, ব্যাপকভাবে নাগরিক সমাজের উপরেও প্রভাব ফেলেছে, যার মধ্যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত। তবে যাই হোক, শাসক দলগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা তাদের আমলের সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে ততোটা সোচ্চার হয়নি এটা সত্যি হলেও, এটা ঠিক নয় যে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে একেবারেই নীরব থেকেছেন। সেইসাথে এটাও ঠিক নয় যে সরকারের মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্বন্ধে অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সমালোচনাও বৈধ হয়নি।

তবুও, বিভিন্ন সরকার তাদের আমলে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ডের সমালোচনাকে তাদের ভাবমূর্তি "কলংকিত" করার জন্য বিরোধীপক্ষের প্রচেষ্টা হিসাবে সাধারণতঃ নাকচ করে দিয়েছে। এইভাবে, তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব থেকে নিজেদের সুবিধাজনকভাবে অব্যাহতি পেতে চেয়েছে।

2.1 সশস্ত্র সহিংসতার সংস্কৃতি

সশস্ত্র অপরাধী গুন্ডাদলের উপস্থিতি এবং সেগুলিকে ভেঙ্গে দিতে সকল সরকারের ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা একটা সশস্ত্র সহিংসতার সংস্কৃতিকে জোরদার করেছে ,যার ফলে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরুদ্ধে অনাচার-অত্যাচার ঘটেছে। এসব সশস্ত্র অপরাধী গুন্ডাদল হয় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট "ছাত্র" গোষ্ঠি , কিংবা মাওবাদী দল হিসাবে নিজেদের চিহ্নিতকারী গুন্ডাদল এবং কিছু রাজনীতিকের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র আছে বলে অভিযোগ।

বেশীর ভাগ "ছাত্র" গোষ্ঠি ১৯৯০ সালের শেষদিকের ছাত্র আন্দোলনের অবশিষ্টাংশ। ঐসময়ে, ছাত্রেরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে। সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদকে ১৯৯০ সালে উৎখাত করতে এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনতে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ আন্দোলন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে, শোনা যায় যে এসব "ছাত্র" গোষ্ঠি তাদের যার যার সংশ্লিষ্ট দলগুলির সমর্থনে নিজস্ব অস্ত্র ও গোলাবারুদের ভান্ডার গড়ে তুলতে শুরু করে। ওরা প্রতিদ্বন্দী দলগুলি কিংবা অন্যান্য দলের সশস্ত্র "ছাত্র" গোষ্ঠির বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করার জন্য প্রায়ই এসব অস্ত্র ব্যবহার করে। বিগত ১০ বছরে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে ঐধরণের সশস্ত্র সংঘর্ষের দৃশ্য দেখা গেছে। প্রত্যেক দল দেশে তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের এলাকা বিস্তার করা কিংবা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ওদের কাজে লাগায়।

টিপু সুলতান
©Private

বাংলাদেশের প্রধান "ছাত্র" গোষ্ঠিগুলি হলোঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল (বিসিডি), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সংশ্লিষ্ট; বাংলাদেশ ছাত্র লীগ (বিসিএল), আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট; এবং ছাত্র শিবির, জামায়াত-ই-ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট। ওরা তাদের নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট দলের যোগসাজসে তৎপরতা চালায় বলে মনে হয়। যখন ওদের দল সরকারী ক্ষমতায় থাকে, তখন ঐ সশস্ত্র "ছাত্র" গোষ্ঠি মানবাধিকার সংক্রান্ত অনাচার-অত্যাচারের অপ্রতিহত সংঘটনকারী হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তাদের দলের রাজনীতিকদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকে বলে শোনা যায়। এসব সশস্ত্র দলের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়াটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার একটা প্রধান কারণ বলে ধারণা করা হয়। এর ফলে গুরুতরভাবে আঘাত ও প্রাণহানি ঘটেছে। ওদের নিরস্ত্র করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টে জানা যায় যে, শক্তিশালী ভাড়াটে গুন্ডাদলগুলি মূলতঃ রাজনৈতিক দলগুলি থেকে স্বতন্ত্র একটা কাঠামো নিয়ে "ছাত্র" গোষ্ঠিগুলির ভিতরে ও বাইরে তৎপর। ওরা আনুগত্য বদলায় এবং রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করে ,যারা আবার তাদেরকে শাস্তি না পাওয়ার ব্যবস্থা করে।

এর বিনিময়ে ওদের সার্ভিস বা সেবার পরিধি রাজনীতিকদের বে-আইনী কর্মকান্ড সম্পর্কে উদ্ঘাটন ধামাচাপা দেওয়া থেকে নিয়ে রাজনীতিকদের সংসদীয় আসন বজায় রাখার জন্য – ভোটারদের ভয়-দেখানো ও জোর করার মাধ্যমে - সহায়তা করা অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য যেসব গোষ্ঠি এই সশস্ত্র সহিংসতা সংস্কৃতিতে অবদান রাখছে তারা প্রধানতঃ সাবেক মাওবাদী গোষ্ঠিগুলি থেকে উঠে এসেছে, যেগুলি কয়েক দশক আগে চরম কমিউনিস্টপন্থী বা মাওবাদের আদর্শে গঠিত, কিন্তু বিগত দশকে ওদের সশস্ত্র অপরাধী গুন্ডাদল হিসাবে অবনতি ঘটেছে বলে জানা যায়। জানা যায় যে, ওরা বিভিন্ন সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধ যেমন চোরাচালান, মানুষ পাচার এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্রপাচারে জড়িত। এদের মধ্যে কয়েকটা দলকে বর্তমানে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তাদের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় তৎপরতা চালায়, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায়। ওদের স্বতন্ত্র কাঠামো আছে কিন্তু স্থানীয় পুলিশ ও রাজনীতিকদের সাথে ওরা পারস্পরিকভাবে লাভজনক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে থাকে, যা তাদেরকে তাদের বে-আইনী কর্মকান্ড শাস্তিবিহীনভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম করে , এবং সেইসাথে পুলিশ ও রাজনীতিকেরা ওদের লুটের বখরা পায় বলে অভিযোগ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মত হলো রাজনীতিক ও সশস্ত্র অপরাধী গুন্ডাদল, পুলিশসহ রাষ্ট্রযন্ত্রগুলি, সেনাবাহিনি ও বিচারবিভাগের নিম্ন আদালতের মধ্যে একটা সংযোগ চক্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজে ব্যবহার হয়। যারা এই চক্রের উদ্ঘাটন কিম্বা চ্যালেঞ্জ করতে চায়, তারা ইচ্ছামতো আটক, নির্যাতন, মৃত্যুর হুমকি ও গুপ্তহত্যার শিকার হন। আর এসব ভুক্তভোগীর মধ্যে প্রায় সময়েই মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরাই থাকেন।

2.2 ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মধ্যেকার উত্তেজনা

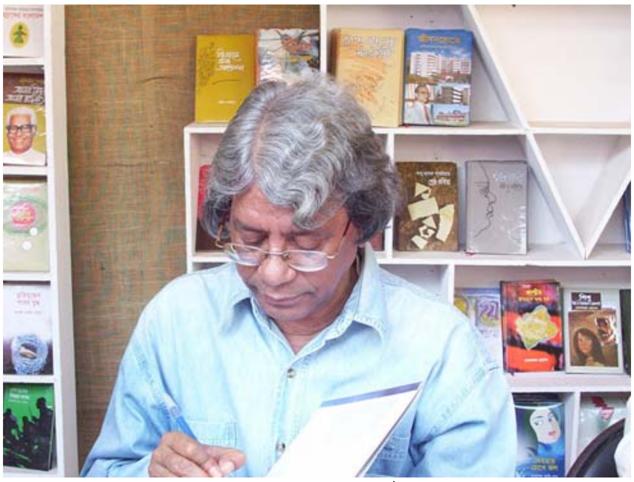

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, তার গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টার সময়কার ছোরার আঘাত থেকে কখনোই সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারেন নি। কয়েক মাস পরে তার মৃত্যু ঘটে, যাকে "স্বাভাবিক কারণ" বলা হয়েছে।
©Private

মানবাধিকার সংক্রান্ত অনাচার অত্যাচার বাংলাদেশের দুটো সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মানসিকতার মধ্যেকার দীর্ঘদিনের উত্তেজনার পটভূমিতেও ঘটেছে। একটাতে জনজীবনে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালী সংস্কৃতির সাথে ব্যক্তিজীবনে ধর্মের (ইসলাম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন জড়িত।[2]
আর অন্যটা, জনজীবন ও ব্যক্তিজীবনের আচরণ, দুই ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ চালায় এমন সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের কঠোর ব্যাখ্যার সাথে জড়িত।[3]

[2] উদাহরণস্বরূপ এই বইটা দেখুন - Jeremy Seabrook, *Freedom Unfinished: Fundamentalism and Popular Resistance in Bangladesh Today*, Zed Books London & New York, 2001.
[3] জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশের ওয়েবসাইট থেকে এই উদ্ধৃতির অংশটা দেখুনঃ "বাংলাদেশের বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মুসলমান। ওরা গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ। কিন্তু কখনো কখনো ওরা জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও সামাজিক নেতাদের দ্বারা

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ভাষার সাথে জড়িত এই বিশ্বাস যে ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দল নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বিবেচনা করে থাকে, তবে সরকার কোন না কোন ভাবে ধর্মীয় দলগুলিকে খুশী রাখার চেষ্টা করে থাকে, সাধারণতঃ সংসদে আরো শক্তিশালী গরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য – এটা এমন এক পদক্ষেপ যা সরকারের নীতির উপর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব রাখতে দেয়। উদারণস্বরূপ, গত ১-লা অক্টোবর ২০০১ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে, জামায়াত-ই-ইসলামীসহ, শাসক জোটের শরীক দলগুলি, দেশের আরো কঠোর ইসলামী আইন চালু করার জন্য সরকারকে চাপ দিয়ে আসছে – তাদের দাবীর মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, একটা ধর্মীয় অবমাননা আইন তৈরী করা এবং এই আইনে দোষী সাব্যস্তদের গুরুদন্ড দেয়ার বিধান। এ পর্যন্ত, সরকার ঐ ধরণের চাপের সামনে নতিস্বীকার করেনি। তবে, মানবাধিকার অনাচার অত্যাচারে জড়িত ইসলামী দলগুলির সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা না করার চাপের সামনে সরকার বাহ্যতঃ নতিস্বীকার করেছে। সরকার আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর সহিংস আক্রমণে জড়িত ইসলামী দলগুলির সদস্যদের বিচার করেনি।[4] এবং, শীর্ষস্থানীয় লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপর ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০০৪, এক আক্রমনে জড়িতদেরও কোন বিচার করেনি।[5]

2.3 উদারপন্থীদের অবস্থান আক্রমণের সম্মুখীন

বাংলাদেশী মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা বিশ্বাস করেন যে দেশে একের পর এক সরকারের আমলে মতপ্রকাশের উদারপন্থী অবস্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন এজন্য যেঃ

- বাক্স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার এবং আইনের কাছে সবার সমান অধিকার, শাসক দলগুলি কিংবা বিরোধী দলগুলির প্রভাবশালী রাজনীতিকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠি খর্ব করছে;

- রাজনীতিকদের ব্যবসাতে জড়িত হওয়া, যারমধ্যে প্রায়সময়েই চোরাচালান এবং অনান্য অপরাধ তৎপরতা জড়িত থাকে, তার ফলে স্থানীয় গুন্ডাদল,

- পুলিশ ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীরা নিজেদের কিংবা তাদের সংশ্লিষ্ট লোকজনের অনাচার-অত্যাচার সংঘটন থেকে জবাবদিহিতা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ;

বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ ইসলামীও নয় সমাজবাদীও নয়। ওরা ধর্মনিরপেক্ষ এই অর্থে যে কোরান ও সুন্নাহ্কে দেশের আইনের মূল উৎস হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি... যদি আল্লাহ, বিশ্বচরাচরের মালিক, সুযোগ দেন, জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ, জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে, সরকার গঠন করবে এবং গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে কোরান ও সুন্নাহ-র আদেশ অনুযায়ী রূপ দেবে... " http://www.jamaat-e-islami.org/about/anintroduction.html (visited 17 May 2004, 16:00 GMT).

[4] আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় যারা নিজেদের ইসলামের একটা শাখা বলে বিবেচনা করে, তাদের অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে আরো জানার জন্য দেখুনঃ Amnesty International, *Bangladesh: The Ahmadiyya Community – their rights must be protected* (AI Index: ASA 13/005/2004), April 2004

[5] আক্রমণকারীরা বিভিন্ন ইসলামী গোষ্ঠির সদস্য বলে ধারণা করা হয় যারা তার বই পাক সারজমিন শাদবাদ (" Pak Sar Zamin Saad Baad") – (পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইন) -ছাপার পর থেকে তাকে বারবার প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছিলো, যে বইটার কাহিনির ভিত্তি বাংলাদেশের ধর্মীয় গোষ্ঠিগুলি যারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনির সাথে সহযোগিতা করেছিলো।

- একের পর এক সরকারের কর্তৃপক্ষের হয় ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় লাভের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি না পাওয়ার চক্রাকারে সুবিধা আরো জোরদার করেছে;

- বাংলাদেশী যেসব সাংবাদিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের রিপোর্ট না করার জন্য – হয় রাজনীতিকদের কিংবা রাজনীতিকদের সাথে সংযুক্ত সশস্ত্র গুন্ডাদলের কাছ থেকে - চাপ প্রতিরোধ করেছেন, তারা ক্রমবর্ধিতভাবে মৃত্যুর হুমকি আর আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাংলাদেশের সকল সরকারই, যেসব লোকজন উর্ধতন কর্মকর্তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত থাকার বিষয় উদ্ঘাটন করতে চান, তাদের প্রতি কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। [6] বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি-নেতৃত্বাধীন সরকার, যারা অক্টোবর ২০০১ ক্ষমতাসীন হয়, তারাও কোন ব্যতিক্রম ঘটায়নি। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর বিএনপি-নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের সমর্থকদের আক্রমণকে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের তুলে ধরার বিরূদ্ধে তারা বিশেষভাবে কড়া প্রতিক্রিয়া দেখায়। শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার রক্ষাকর্মী শাহরিয়ার কবির-কে নভেম্বর ২০০১-এর শেষদিকে থেকে জানুয়ারী ২০০২-এর শেষদিকের মধ্যে আটক ও নির্যাতনের ভুক্তভোগী করে, তার ভারত সফরে গিয়ে ঐসব হিন্দু পরিবারের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর, যারা অক্টোবর ২০০১-এর সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশে নিপীড়ন এড়াতে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

একইভাবে, দেশের ইসলামী গোষ্ঠিগুলি আর সহিংস বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে যোগসূত্রের অভিযোগ যেসব সাংবাদিক অনুসন্ধান করতে চান, সরকার তাদের প্রতিও দৃঢ় বিরোধিতা দেখায়। এনামুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাংলাদেশের বার্তা সংস্থা)-র সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার এবং বাংলাদেশে রয়টারের একজন সংবাদদাতাকে, আটক করে (১৩ই ডিসেম্বর ২০০২ থেকে ৫ই জানুয়ারী ২০০৩ পর্যন্ত) এবং নির্যাতন করে, রয়টারের কয়েকটা রিপোর্টে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বরাত দিয়ে মন্তব্য ছাপার জন্য। ঐ রিপোর্টগুলিতে বলা হয়েছিলো যে, ৭ই ডিসেম্বর ২০০২-এ উত্তরের ময়মনসিংহ শহরের চারটি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের জন্য পুলিশ কয়েকটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠিকে সন্দেহ করেছে।

উদারপন্থী অবস্থানের প্রতি অন্য গুরুতর হুমকি হলো ,বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাওবাদী গোষ্ঠির আদর্শে তৎপর গুন্ডাদলগুলি,যারা, এই রিপোর্টের বিভিন্ন অংশে যেমনটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, প্রায়ই তাদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের যোগসূত্র উদ্ঘাটনের জন্য সাংবাদিকদের উপর হামলা চালিয়েছে, এবং প্রকাশ্যে তার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। যেসব মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন তাদের প্রতি কতগুলি ইসলামী গোষ্ঠিও কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

2.4 *এনজিওদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে*

সব সরকারই এনজিও-দের কর্মকান্ডের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে চেয়েছে। তবে, বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় আসার পর, কতগুলি এনজিও, বিশেষ করে যারা নারীদের কিংবা সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন চাইছে, তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯শে অক্টোবর ২০০১-এ তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেনঃ

[6] উদাহরণস্বরূপ, সাংবাদিক টিপু সুলতান আর প্রবীর শিকদারকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) আওয়ামী লীগের রাজনীতিকদের সমালোচনা করে লেখা ছাপানোর পর , আক্রমণ করা হয় এবং গুরুতরভাবে জখম করা হয় , কিন্তু আক্রমণকারীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

“গত ৩০ বছরে, এনজিও-রা সরকারের সাথে মিলে দারিদ্রদূরীকরণ, বৈষম্য নির্মূল এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করেছে। আমরা এই পথ বজায় রাখতে চাই।

“কিন্তু, কিছু মুষ্টিমেয়-সংখ্যক এনজিও, নিজেরা দলীয় রাজনীতি ও মতামতে জড়িত হওয়ার ফলে, তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ ও বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

“বিদেশী সাহায্য দলীয় রাজনীতির জন্য ব্যবহার করাটা গুরুতর অপরাধ। ঐধরণের এনজিওদের খারাপ কাজকর্মের যথাযথ তদন্ত করা হবে এবং দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রজাতন্ত্রের আইন ভঙ্গ করে যা খুশী তাই করতে কাউকে দেওয়া হবে না।”[7]

এই ভাষণ হয়রানির একটা নীলনকশা হিসাবে মনে করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যেসব এনজিও-কে লক্ষ্যবস্তু করা হয় তাদেরকে তাদের তহবিল অব্যবস্থাপনার জন্য অভিযুক্ত করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির তদন্তের আওতায় আনা হয়। ওদের তহবিলের লেনদেন বন্ধ করে রাখা হয়, যার ফলে তাদের উন্নয়ন ও ত্রাণ কর্মসূচী, যাকিনা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য করা, সেগুলি কার্যতঃ আটকে পড়ে। দাতাদের নিজস্ব অডিট বা হিসাবপরীক্ষণ পদ্ধতির আওতায় ঐসব এনজিও-র আর্থিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগের স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি, যাদের বিরূদ্ধে এর অভিযোগ সরকার তুলেছে। ওদের সম্পদের লেনদেনের উপর বাধানিষেধ তুলে নেওয়ার জন্য দাতাদের কাছ থেকে অনুরোধ সরকার অগ্রাহ্য করেছে।

কিছু বিশিষ্ট এনজিও যারা এই হয়রানির ভুক্তভোগী হয়, তাদের মধ্যে ছিলো প্রোশিকা ("এ সেন্টার ফর হিউম্যান ডেভেলাপমেন্ট ") , আর পিআরআইপি ট্রাস্ট।

● **প্রোশিকাঃ** নির্বাচনের পর পর, কর্তৃপক্ষ প্রোশিকার জন্য (বাংলাদেশের অন্যতম সবচেয়ে বড় বেসরকারী সংস্থা, যারা টেঁকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করে), দাতাদের তহবিল আটকে দেয়, এবং ঐ সংস্থাকে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্তের অধীন করে। তবে, ঐ তদন্তের স্বচ্ছতা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ ছিলো। দাতারা সরকারের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে যে তদন্ত চলাকালে ঐ এনজিও-র পুরো কর্মসূচী আটকে দেওয়ার কোন যুক্তি তারা দেখছে না, যেহেতু তাতে করে দাতাদের দেওয়া তহবিলের অর্থায়নে হাজার হাজার মানুষের সহায়তা বন্ধ হয়ে যাবে।

মে ২০০৪-এর গোড়ার দিকে, সরকার প্রোশিকাকে অভিযুক্ত করে যে তারা সরকার উৎখাতের জন্য বিরোধী পক্ষের সাধারণ ধর্মঘটের এক আন্দোলনে সরকার-বিরোধী অবস্থান নিচ্ছে। প্রোশিকা কোন রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে , কিন্তু পুলিশ ঢাকায় তাদের অফিসগুলিতে হানা দেয়।

২২শে মে ২০০৪-এ এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ঐ গ্রেফতার সম্বন্ধে এবং ডঃ কাজী ফারুক আহমদ ও ডেভিড উইলিয়াম বিশ্বাস, যথাক্রমে প্রোশিকার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর উপর নির্যাতনের সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এমন দৃঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ওদের গ্রেফতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিলো। ঐ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় প্রোশিকার উপর বর্তমান সরকারের দীর্ঘদিনের হয়রানির পর, যারা অভিযোগ তোলে যে প্রোশিকা বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময়ে বর্তমান শাসক জোটের বিরূদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানে জড়িত ছিলো। প্রোশিকার নেতাদের গ্রেফতারের কয়েক মাস আগে, ২০শে এপ্রিল ২০০৪, প্রোশিকার একজন ম্যানেজার, আবদুর রব-কে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ তাকে তিনদিন পর কোর্টে নিয়ে আসে, এই দাবী করে যে তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে,

7 দেখুনঃ http://www.bangladeshgov.org/pmo/pmspeechbnp/spch_e191001.htm (visited 14 June 2004, 12:20 GMT)

প্রোশিকা রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত ছিলো। আদালতে, তিনি তার ঐ স্বীকারোক্তি অস্বীকার করেন, এই বলে যে পুলিশ তাকে নির্যাতন করে ওটা সই করতে বাধ্য করে। তবে নির্যাতন সম্বন্ধে কোন কার্যকর তদন্ত চালানো হয়নি এবং পরে তাকে দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। জুন ২০০৪-এর গোড়ার দিকে, আবদুর রব ও ডেভিড উইলিয়াম বিশ্বাস দুজনকেই জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয় কিন্তু তাদের বিরূদ্ধে অভিযোগ মুলতুবী রাখা হয়। জুন ২০০৪ পর্যন্ত, প্রোশিকার নেতা, ডঃ কাজী ফারুক আহমদকে ১৮টি ফৌজদারি মামলায় জড়িত করা হয়, যারমধ্যে তার এবং তার ছয়জন সহকর্মীর বিরূদ্ধে ২০শে জুন ২০০৪ দেশদ্রোহিতার একটা মামলা দায়ের করা হয়। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আর্থিক অনিয়মের তদন্ত করার ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব স্বীকার করে, তবে ঐধরণের তদন্তে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। প্রোশিকার বিরূদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ তাদের বিরূদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের তুলনায় অনুপাতবিহীন বলে মনে করা হয়।[8]

● **পিআরআইপি ট্রাস্ট**, একটি এনজিও যারা কাজ করছে “নাগরিক সমাজ, সরকার ও ব্যবসার ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মীদের মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাবনা বিকাশে সহায়তা দেওয়ার জন্য ”, তারা বর্তমান সরকারের হয়রানির লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। এদেরকেও, এনজিও হিসাবে তাদের কর্মপরিধির বাইরে, রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। এদের তহবিলের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এদেরকে একাধিক এজেন্সি পর্যায়ক্রমে তদন্ত করেছে, যারা প্রত্যেক সময়ে, তাদের পুরো ফাইল ও রেকর্ড নতুন করে দেখেছে।

এ্যারোমা দত্ত, এক্সিকিউটিব ডিরেক্টর, পিআরআইপি ট্রাস্ট

©Private

সরকার বাহ্যতঃ পিআরআইপি ট্রাস্টের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি, এবং কয়েকটা দাতা সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের রেকর্ডের স্বতন্ত্র অডিট করার মাধ্যমে তাদের তহবিলের অব্যবস্থাপনার অভিযোগের স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি।

ধারণা করা হচ্ছে পিআরআইপি ট্রাস্টের এক্সিকিউটিব ডিরেক্টর, এ্যারোমা দত্ত, অক্টোবর ২০০১ –এর সাধারণ নির্বাচনের সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরূদ্ধে আক্রমনের বিরোধিতা করার যে উঁচু ভাবমূর্তির অবস্থান নিয়েছিলেন, তার জন্যেই হয়তো এ্যারোমা দত্ত ও পিআরআইপি ট্রাস্টের বিরূদ্ধে ঐ দলগুলি(ক্ষমতায় আসার পর) পদক্ষেপ নিতে প্ররোচনা দিয়েছে।

[8] উদাহরণস্বরূপ ডঃ ফারুক-এর উকিল তার জামিনের এক দরখাস্তে বলেন “... যে এই ক্ষেত্রে (ফৌজদারি ষড়যন্ত্র) যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেগুলি অস্পষ্ট, ভিত্তিহীন আর অপ্রমানিত এবং কল্পনার কোন প্রসারেই ফৌজদারি দন্ডবিধির এই 120A/124B/34 ধারাগুলির অধীনে অপরাধ বলে গণ্য করা যায় না, এবং এমনকি তা সত্যি হলেও , তা একজন নাগরিকের স্বাধীন মত প্রকাশের চেয়ে বেশী কিছু হবে না, যা এক গণতান্ত্রিক সমাজে তার মৌলিক অধিকার।”

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট, জাস্টিস শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ২৫-শে সেপ্টেম্বর ২০০১ (গত সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে), লেখা এক চিঠিতে এ্যারোমা দত্ত লিখেছিলেনঃ

" মানবাধিকার কর্মী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসাবে , আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করাটা আমার সচেতন (sic) (বিবেক?) , এবং আমার কর্তব্য, এই অবহেলিত সম্প্রদায়, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ("HINDU MINORITIES") উপর জাতীয় নির্বাচন ২০০১-এর সময়ে অব্যাহত হামলা সম্বন্ধে (sic), ... তাদেরকে তাদের ভোট দিতে নিবারণ করা, যা কিনা তাদের মৌলিক অধিকার।"

তিনি তার চিঠিতে পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন যে হিন্দু সংখ্যালঘুরা আক্রমণের সম্মুখীন হবে এবং সাধারণ নির্বাচনের পর তাদের রক্ষার জন্য তৎকালীন সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি একইদিনে একই ধরণের চিঠি তত্বাবধায়ক সরকারের তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা, বিচারপতি লতিফুর রহমানের কাছেও লিখেছিলেন এবং আরেকটা লিখেছিলেন তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০১-এ। সাধারণ নির্বাচন অক্টোবর ২০০১-এর সময়ে ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এ্যারোমা দত্ত-র ঐ আশঙ্কা প্রমাণ করে। নির্বাচনের পর, শয়ে শয়ে হিন্দু পরিবারকে সহিংস হামলার শিকার হতে হয়, যারমধ্যে ধর্ষণ, মারধোর এবং তাদের সম্পত্তিতে আগুন ধরানো অন্তর্ভুক্ত ছিলো। খবরে জানা যায় যে ওদেরকে বিএনপি সমর্থকেরা আক্রমণ করেছিলো কারণ তারা মনে করেছিলো যে ওরা আওয়ামী লীগের সমর্থক।[9]

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো পিআরআইপি ট্রাস্টের বিরূদ্ধে আরো দুটো অভিযোগ করেছেঃ

"মহিলাদের-পরিচালিত এনজিও-দের সহায়তা যোগানোঃ এই সংগঠন [পিআরইপি] নারীদের-পরিচালিত কয়েকটি এনজিওকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, এই প্রকল্পে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছাড়াই। ঐধরণের খরচের হিসাবের স্টেটমেন্ট আর বিল-ভাউচার ঐ সংস্থা রাখেনি। এনজিও সহযোগীরা ঐ টাকা যে জন্য খরচ করে তার সাথে উপরের সার্কুলারের প্যারা 5(d)–র একেবারেই কোন সম্পর্ক নেই এবং ঐ সংস্থাগুলি উপরের প্যারা 6.3 (b) লঙ্ঘন করেছে।"

"নাগরিক সমাজের জন্য সহায়তা যোগানোঃ এই সংস্থা প্রকল্পের বন্দোবস্ত ছাড়াই নাগরিক সমাজকে সহায়তা দিয়েছে। এর আওতায়, বিদেশে সফর কোন বাজেট ছাড়াই আয়োজিত হয়। কয়েকটি সংস্থাকে রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য অনুদান দেওয়া হয়, যার জন্যেও এনজিওএবি-র কোন অনুমতি ছিলো না। এইভাবে উপরের সার্কুলারের প্যারা 5 (d), 6.3 (b) এবং প্যারা 8.2 (c) পালিত হয়নি।

পিআরআইপি ট্রাস্ট এসব অভিযোগ খন্ডন করেছে, এবং দাতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, এই সংস্থা তাদের কর্মকান্ড চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল পেতে সক্ষম হয়নি।

প্রোশিকার বিরূদ্ধে তোলা অভিযোগের মতোই পিআরআইপি ট্রাস্টের বিরূদ্ধে অভিযোগও সাধারণ ধরণের, যারমধ্যে বিস্তারিত বিবরণ নেই। এসব অভিযোগ – যার উল্লেখ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে পিআরআইপি ট্রাস্টের কাছে দেওয়া এক চিঠিতে আছে – সেগুলির তালিকা এইভাবে আছেঃ "সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা দায়িত্বশীল তহবিল যোগানোর উপযুক্ত নয়"; ওদের হিসাব-রক্ষণ ব্যবস্থা আইন "লঙ্ঘন" করেছে; অননুমোদিত তহবিল রেখেছে; ওদের কাছে

[9] দেখুনঃ Amnesty International, *Bangladesh: Attacks on members of the Hindu minority* (AI Index: ASA 13/006/2001), published on 1 December 2001.

"অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনের" পাঠানো প্রকল্পের জন্য তহবিল দিয়েছে; "কনসালটেন্সি ফী"-র অনিয়মিত পেমেন্ট ; গাড়ীর অনিয়মিত পেমেন্ট ; "শাখা এনজিও গঠন ও তহবিলের বে-আইনী ট্রান্সফার"।[10]

অন্যান্য যে এনজিও এইধরণের হয়রাণির সম্মুখীন হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সঙ্ঘ (বিএনপিএস), একটি অধিকার-ভিত্তিক সংগঠন যারা সহিংসতার বিরূদ্ধে নারীদের আন্দোলন নিয়ে কাজ করছে, এবং নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিকাশ ঘটাচ্ছে।

3. লঙ্ঘন ও সেগুলির কারণ

অদক্ষ প্রশাসন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দেশের মধ্যে গুরুতর রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং জবাবদিহিতার অভাব মানবাধিকার অনাচার-অত্যাচারের প্রধান কারণগুলি। বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা কর্তৃত্বের অপব্যবহার, আইনের শাসন লঙ্ঘন, দুর্নীতি ও শাস্তিবিহীনতার বিরূদ্ধে বিগত এক দশক ধরে তাদের সংগ্রামে গুরুতর প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের সম্মুখীন হয়েছেন। ওরা মানবাধিকার লঙ্ঘনকে তুলে ধরতে সক্রিয় আছেন, যারমধ্যে নির্যাতন, ইচ্ছামতো আটক, এবং সেইসাথে নারী ও সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন অন্তর্ভূক্ত।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পাওয়া তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী যারা অনাচার-অত্যাচারের ঝুঁকির সম্মুখীন তারা সেইসব মানবাধিকার রক্ষাকর্মী যারাঃ

- মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কর্তৃপক্ষ বা শাসক জোটের দলগুলির অনবরত সমালোচনা করেন;
- যেকোন দলের রাজনীতিক, পুলিশ ও সশস্ত্র গুন্ডাদলের মধ্যেকার যোগসূত্র উদ্ঘাটন করেন;
- শাসক প্রশাসন এবং আইন বলবৎকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতির উদ্ঘাটন করেন;
- সংখ্যালঘুদের বিরূদ্ধে অনাচার অত্যাচারের উদ্ঘাটন করেন;
- ইসলামী দলগুলির মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমালোচনা করেন;

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা নিম্নলিখিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেনঃ

- গ্রেফতার, নির্যাতন, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ফৌজদারি অভিযোগ, যখন তারা সরকারের কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন কিংবা বিরোধী দলগুলির রাজনীতিকদের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরূদ্ধে কথা বলেছেন।
- ইসলামী গোষ্ঠিগুলি কিংবা শাসক দলের কর্মীদের পক্ষ থেকে দৈহিক আক্রমণ, যখন তারা ওদের সহিংস তৎপরতা কিংবা সংখ্যালঘুদের অনাচার-অত্যাচারে ওদের জড়িত থাকার বিষয় উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন;
- সশস্ত্র গুন্ডাদলগুলির দৈহিক আক্রমণ, যখন তারা চোরাচালান ও দুর্নীতি ও সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন, তখন তাদের বিভিন্ন গুন্ডাদলের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে হয়েছে, যে দলগুলি এসব অনাচার-অত্যাচারকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট , কিংবা ভাড়া করা বলে, পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়েছে।

[10] পিআরআইপি ট্রাস্টের কাছে পাঠানো এনজিও ব্যুরো, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, থেকে পাঠানো চিঠি, তারিখ ১২-ই জানুয়ারী ২০০৩ Index: D.O.No.:NGOAB/A-4/PT/85-14/2002/2030.

বাংলাদেশের সরকারগুলি ঝুঁকির সম্মুখীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেওয়ার, তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সাড়া দিতে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিচার করতে,এবং সাক্ষীদের, ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কিংবা ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দিতে ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

3.1 *ইচ্ছামতো গ্রেফতার ও নির্যাতন*

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ইচ্ছামতো গ্রেফতার ও আটক রাখা হয়েছে কর্তৃপক্ষদের অহিংসভাবে সমালোচনার বাহ্যতঃ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। ঐ ধরণের আটক ব্যক্তিদের হেপাজতে রাখার সময়ে সাধারণতঃ নির্যাতন কিংবা দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। চারজন মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, সলীম সামাদ আর প্রিসিলা রাজ-কে ২০০২ সালের শেষদিকে যে অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় যে তারা বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় হয়েছিলো বলে জানা যায়।

সলীম সামাদ

©Private

কোন ব্যক্তিকে যদি কেবলমাত্র তার বাক্‌স্বাধীনতা ও মেলামেশার মৌলিক অধিকার শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের কারণে আটক করা হয় তাহলে তা ইচ্ছামতো আটক বলে এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে গণ্য হয়, যারমধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন (আইসিসিপিআর) (ICCPR)-এর ধারা ৯ ও ১৯-এর লঙ্ঘন এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সংক্রান্ত ঘোষণার ১২ ধারারও লঙ্ঘন।

গ্রেফতারগুলি সাধারণতঃ ফৌজদারি দন্ডবিধির ৫৪ ধারার আওতায় করা হয়, যার আওতায় পুলিশ যে কাউকে কোন পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার করতে পারে এবং ২৪ ঘন্টার জন্য আটক রাখতে পারে।[11] যাদের ৫৪ ধারায় আটক করা হয় তাদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে হয় ছেড়ে দিতে হয় অথবা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হয় – হয় কোন ফৌজদারি অপরাধের জন্য আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত করার জন্য কিংবা আরো পুলিশী হেপাজতে রাখার জন্য। এখানে ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষ থেকে তাদের ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কে উপযুক্ত সতর্কতার গুরুতর অভাব আছে বলে মনে হয়। প্রকাশ যে তারা প্রায়ই বিষয়টির পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হন এটা নিশ্চিত করতে যে পুলিশের হেপাজতে রাখার বস্তুনিরপেক্ষ ও বৈধ কারণ আছে কিনা , যারফলে, তারা কার্যতঃ লোকজনকে ইচ্ছামতো আটকের শিকার হতে দেন। এছাড়া ক্রমাগতভাবে জানা যায় যে, ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্যাতনের অভিযোগ গুরুতরভাবে নেন না।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ অর্ডিন্যান্স ১৯৮৬-র ধারা ৮৬ ব্যবহার করা হয়েছে, ইচ্ছামতো লোকজনকে আটক রাখার জন্য, যাদের মধ্যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ধারার আওতায় পুলিশ যে কাউকে " সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে পাওয়া গেলে" আটক রাখতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ একজন মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর আটক অব্যাহত রাখার ইচ্ছা দেখিয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, তারা একজন মানবাধিকার রক্ষাকর্মীকে, একের পর এক কেস বা মামলায় জড়িত করেছে যা

[11] আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশঃ মানবাধিকার রক্ষার জন্য আইনগত ও অন্যান্য সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন (AI Index: ASA 13/012/2003), published May 2003.

শেষ পর্যন্ত অপ্রমাণিত ফৌজদারি অভিযোগ বলে দেখা গেছে। আবু সৈয়দ, একজন উন্নয়ন কর্মী ,যিনি একটি হিন্দু পরিবার, যাদের উপর জামায়াত-ই-ইসলামী সদস্যরা বারবার আক্রমণ চালায় বলে জানা যায়, তাদেরকে পুলিশের কাছে অভিযোগ ফাইল করতে বলার জন্য, তিনি নিজে হয়রানির লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েন, কারণ পুলিশ ২০০২ সালের শেষদিকে বাহ্যতঃ বানোয়াট ফৌজদারি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে সবমিলে সাতটি মামলা দায়ের করে।

আবু সৈয়দ-কে পুলিশের হয়রানির শিকার হতে হয়েছিলো।
©Private

বন্দীর ছাড়া পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো হাই কোর্টের কাছে দরখাস্ত করা। এই কোর্ট, এপর্যন্ত, কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ থেকে নিজেদের উল্লেখযোগ্যভাবে উঁচুমাত্রায় স্বাধীন দেখিয়েছে এবং বিচারবিভাগীয় বিচার যুগিয়েছে। তবে, এই প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীভাবেই কোর্টগুলির সামনে বিপুল জমে-থাকা মামলায় আরো যোগ করে। এছাড়া আটক ব্যক্তিদের পরিবারদের জন্যেও এটা ব্যয়বহুল, যেহেতু তাদের আত্মীয়দের জামিনে ছাড়ার জন্য তাদেরকে বন্ড দিতে হয়, এবং সময়ে সময়ে জামানতও দিতে হয়।

যেসব উকিল ৫৪ ধারায় কিংবা মেট্রোপলিটান পুলিশ অর্ডিন্যান্স ১৯৮৬-র অধীনে আটক বন্দীদের পক্ষে কাজ করেন, অথবা যাদেরকে পুলিশের হেপাজতে রাখা হয়, তারা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছে এই স্বীকৃতি দিয়েছেন যে তাদের মক্কেলরা নিয়মিতভাবে তাদের পরিবারদের দেখা করতে আসতে দিতে পারেন নি, পর্যাপ্ত ডাক্তারি চিকিৎসার সুবিধা পাননি কিংবা তাদের উকিলের সাথে দেখা করতে পারেননি। আটক ব্যক্তিদের কাজে কাজেই বিশেষ করে নির্যাতন বা দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।[12] আর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নিয়মমাফিক নির্যাতন প্রয়োগ করা হয়। কোন পরোয়ানা বা ওয়ারেন্ট নিয়ে গ্রেফতার করা হলেও , আটক ব্যক্তিকে কারুর সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়না, এবং তার উপর প্রায়ই নির্যাতন কিংবা দুর্ব্যবহার করা হয়।

যেসব মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর ছাড়া পাওয়ার পর এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সাক্ষাৎকার নিয়েছে, তারা তাদের আটকের প্রাথমিক অবস্থায় নির্যাতন বা দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বেলায়, এমন কি ম্যাজিস্ট্রেটরাও আটকের কারণ এবং নির্যাতনের অভিযোগ পরীক্ষা করতে কম ইচ্ছুক বলে জানা যায়। ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর কর্তৃপক্ষের বেশ প্রভাব আছে, এবং জানা যায় যে, তারা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর আটকের একটা আইনগত ভিত্তি পাওয়ার জন্য এই প্রভাব খাটায়। কয়েকজন মানবাধিকার রক্ষাকর্মীকে পুলিশ বলেছে যে তাদের গ্রেফতার ও জেরা – যাতে প্রায়সময়েই নির্যাতন করা হয – তার জন্য উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তারা হুকুম দিয়েছেন।

নির্যাতন ও অন্যান্য ধরণের নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানকর আচরণ কিংবা শাস্তি আন্তর্জাতিক আইনে একেবারেই নিষিদ্ধ, যে আইনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আইসিসিপিআর (ধারা ৭) এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে চুক্তি। আরো বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক আইন এবং সুনির্দিষ্টভাবে নির্যাতনের বিরুদ্ধে চুক্তির ধারা ১৫-র অধীনে, নির্যাতনের ফলে কোন বিবৃতি দেওয়া হলে সেটা কোন মামলার শুনানিতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে দাখিল করা যাবে না। নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার থেকে মুক্ত থাকার অধিকার আন্তর্জাতিক আইনের এক মৌলিক নীতি এবং এমন কি জরুরী অবস্থার সময়েও কখনোই তা থেকে সরে যাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর নিশ্চয়তা বিধান করা আছে। আন্তর্জাতিক

[12] দেখুন, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশঃ নির্যাতন ও শাস্তিবিহীনতা (AI Index: ASA 13/07/2000), published November 2000.

আইন এবং তাদের সংবিধানের অধীনে নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার নিবারণ করতে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা আছে। নির্যাতনের মধ্য দিয়ে কোন স্বীকারোক্তি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেলে তার একটা উপযুক্ত তদন্ত অবশ্যই করতে হবে।

নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার যাতে নিষিদ্ধ থাকে তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রদের কেবল যে বাধ্যবাধকতা আছে তাই নয়, সেইসাথে তাদের অবশ্যই কতগুলি পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে ওগুলি আবার না ঘটে। এরমধ্যে আছে আইন তৈরী সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং বিচারবিভাগীয় পদক্ষেপ। ওগুলির মধ্যে অন্যান্য পদক্ষেপও অবশ্যই থাকতে হবে যেমন আইন বলবৎকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং জেরা করার পদ্ধতিগত কৌশল।

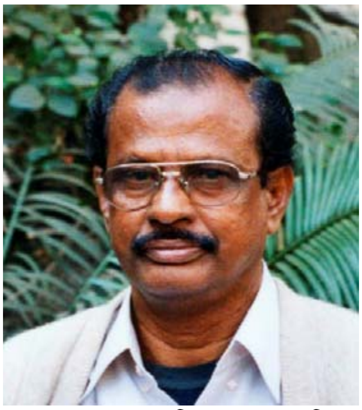

আবুল খায়ের-কে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো “সঙ্ঘবদ্ধ সন্ত্রাস” সংগঠিত করার জন্য, যখন তিনি জোর দিয়ে বলেন যে যেসব হিন্দু পরিবার মানবাধিকার অনাচার-অত্যাচারের শিকার হয়েছেন পুলিশকে তাদের অভিযোগ ফাইল করা উচিত।
©Private

জামিনে ছাড়া পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেক সপ্তাহ বা মাস লেগে যেতে পারে। শুনানীর জন্য আদালতে দরখাস্ত গেলে তখন আদালত সাধারণতঃ আটক ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেয়। তবে, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বেলায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় প্রায় সময়েই হাই কোর্টের আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এই বিচারবিভাগীয় সমাধান আটকে দেওয়ার জন্য, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ আদালতে কেবলমাত্র এটুকু জানায় যে আটক ব্যক্তির মুক্তির জন্য আদালতের আদেশ তারা কার্যকর করতে পারেনি কারণ সে অন্য আরেকটা মামলায় জড়িত। এখানেও বিচারবিভাগীয় সমাধান পাওয়ার দায়িত্ব বন্দীর পরিবারের উপরেই গিয়ে পড়ে - নতুন মামলায় আপীল করার মধ্য দিয়ে – যে সময়ের মধ্যে বন্দীকে অব্যাহতভাবে হেপাজতে রেখে দেওয়া হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে , মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের দেশদ্রোহিতার দায়ে আটক রাখা হয়, যার জন্য শাস্তি তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন জেলও হতে পারে। যদিও এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পরিচিত মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয়নি, তাও তাদেরকে হেপাজতে রেখে দেওয়া হয়েছে, অভিযুক্তের জামিনে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উদ্বিগ্ন যে ফৌজদারি দন্ডবিধির ধারা ১২৪এ-র আওতায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগ অত্যন্ত সাধারণ কথায় বলা আছে এবং যারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বাকস্বাধীনতা ও মেলামেশার অধিকার প্রয়োগ করতে চান তাদের আটক রাখার জন্য কাজে লাগানো হয়েছে।[13]

যেসব মামলার বেলায় সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর বাহ্যতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করতে রাজী না হয়, সেক্ষেত্রে রক্ষাকর্মীদের নিয়মিতভাবে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে লাগে (সাধারণতঃ এক মাসের মধ্যে) এটা প্রমাণ করার জন্য তারা দেশ ছেড়ে চলে

[13] ফৌজদারি দন্ডবিধির ধারা ১২৪এ ধারায় (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত সংশোধিত) বলা হয়েছেঃ “যে কেউ মুখের কথা বা লেখার মাধ্যমে, কিংবা ইঙ্গিতের মাধ্যমে, কিংবা প্রকাশ্যভাবে অথবা অন্যভাবে, আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবমাননা সৃষ্টি করে বা তার চেষ্টা করে, অথবা অসন্তোষ সৃষ্টিতে উস্কানী দেয় কিংবা উস্কানী দেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন জেল হতে পারে, যার সাথে জরিমানা যোগ হতে পারে, কিংবা তিনবছর পর্যন্ত জেল, যারসাথে জরিমানা যোগ হতে পারে, অথবা জরিমানাসহ জেল হতে পারে।”

যান নি – এটা করতে তাদের প্রায় একটা পুরো দিন লেগে যায় এবং সময়ের সাথে এটা ঐ ব্যক্তির চলাফেরা, পেশা ও জীবিকার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে।

দুইবছর আগে পর্যন্ত [14] , সরকার সাধারণতঃ একটা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীর অব্যাহত আটকাদেশ জারী রাখতে চেয়েছে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ –এর বলে (এসপিএ) যার আওতায় ইচ্ছামতো আটক রাখার বিরূদ্ধে বাংলাদেশের আইনের রক্ষাকবচগুলি মানতে হয়না, এবং একজন আটক ব্যক্তিকে বিনাবিচারে চারমাস পর্যন্ত আটকে রাখার অনুমতি দেয়। [15] যদিও ঐ আটক ব্যক্তিকে জেলের হেপাজতে পাঠানো হয় যেখানে ওদের পুলিশের জেরা করার এবং নির্যাতন করার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু তাও ওদেরকে বিনা অভিযোগে আটক রেখে দেওয়া হয়। তবে, হাইকোর্ট তাদের সামনে যতো মামলাই যায় ততোগুলির ক্ষেত্রে রায় দিয়েছে যে এসপিএর আদেশের মধ্যে আইনগত ভিত্তি নেই এবং আটক ব্যক্তিদের মুক্তির আদেশ দিয়েছে। বিগত কয়েক বছরে সরকার এসপিএ খুব কমসময়েই মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরূদ্ধে ব্যবহার করেছে। এর বদলে তারা ইতিমধ্যেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের বিরূদ্ধে পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন ফৌজদারি অভিযোগ আনার কৌশল ব্যবহার করেছে। তবে, ঐ অভিযোগগুলির যেহেতু ভিত্তি থাকে না, তাই প্রায় সব ক্ষেত্রেই, হয় তাদের মামলা নাকচ হয়ে যায় , কিংবা আটক ব্যক্তিকে জামিনে ছাড়া হয়।

3.2 বেঁচে থাকার অধিকার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার লঙ্ঘন

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের উপর সাধারণতঃ হামলা করেছে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সংগৃহীত তথ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এসব আক্রমনের একটা ধরণ আছে। বেশীর ভাগ ঝুঁকির সম্মুখীন হলেন সাংবাদিকেরা, যারা আইন বলবৎকারী সংস্থার যোগসাজসে সশস্ত্র গুন্ডাদলের ফৌজদারি অপরাধমূলক তৎপরতার বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন। সাংবাদিকেরা সাধারণতঃ দৈহিকভাবে আক্রমণের আগে বারংবার প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন।

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন যে আক্রমণের উস্কানীদাতারা কেবল গুন্ডাদলের ঐ নেতারাই নয় যাদের ফৌজদারি অপরাধমূলক তৎপরতার রিপোর্ট তারা করেছেন, সেইসাথে স্থানীয় রাজনীতিকেরাও আছেন যারা ঐ সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধ, যেমন চোরাচালান ও মানুষ পাচার থেকে ফায়দা পাচ্ছেন বলে ধারণা করা হয়। একজন সাংবাদিক ও মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেনঃ

---

[14] সরকার এসপিএ ব্যবহার করে শাহরিয়ার কবিরকে ২০০১ সালের শেষদিকে ও ২০০২ সালের গোড়ার দিকে দুইমাসের উপর আটক রাখে।

[15] এসপিএ-র অধীনে আটক রাখার কারণ দেওয়া হয়েছেঃ " [কোন ব্যক্তিকে] কোন পক্ষপাতদুষ্ট কাজ করতে নিবারণ করা ", উদাহরণস্বরূপ, " জনসাধারণের মধ্যে কিংবা জনসাধারণের একাংশের মধ্যে ভীতি বা আতঙ্ক ঘটানো " অথবা প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, আইনের প্রয়োগ, অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ও সেবা, এবং অর্থনৈতিক বা আর্থিক স্বার্থের বিষয়ে " পক্ষপাতদুষ্ট " করানো। এতে সাধারণভাবে বিধান তৈরী করা হয়েছে যার আওতায় লোকজনকে তাদের বাক্-স্বাধীনতা হরণ করে আটক রাখা যায়। বাংলাদেশের সরকারগুলি রাজনৈতিক বিরোধীদের আটক রাখার জন্য এই আইনের প্রয়োগ প্রায়ই করেছে। এর অপব্যবহারের পরিধি এমনই যে বিএনপি তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে এই আইন বাতিলের ঘোষণা দেয়, যদিও একবার ক্ষমতায় যাওয়ার পর , তারা এসপিএ বহাল রাখে এবং তা প্রায়ই ব্যবহার করে। এসপিএ-র প্রয়োগ সম্বন্ধে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগের বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য দেখুনঃ Amnesty International, *Bangladesh: Urgent need for legal and other reforms to protect human rights*, (AI Index: ASA 13/012/2003), May 2003.

নজমুল ইমাম, কুষ্টিয়ার একজন সাংবাদিক ও মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, যিনি কয়েকবার আক্রমণের শিকার হয়েছেন

"যেসব সাংবাদিক তাদের সময়ের শাসক দলের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন তারা জানেন যে তারা বাড়ীতে থাকতে পারবেন না কারণ ওদের সদস্যরা পরে তাকে খুঁজতে আসবে; কয়েকজন সাংবাদিক, যাদের লেখার জন্য সশস্ত্র গুন্ডাদল তাদের আক্রমণ করার হুমকি দেয় তাদেরকে সুরক্ষা-র টাকা না দিয়ে উপায় ছিলোনা। কিছু সাংবাদিকের এমন ঘটনাও আছে, যাদেরকে স্থানীয় রাজনীতিক কিংবা তাদের সংশ্লিষ্ট দলের ভাড়া-করা সশস্ত্র গুন্ডাদল মারধোর করেছে এবং হাসপাতালে নিতে দেয়নি।"

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সাক্ষাৎকার নিয়েছে এমন কয়েকজন সাংবাদিক প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা বলেন যে ঐ হুমকিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে তারা ঐ লেখায় যেসব লোকের নাম করেছেন তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা যেন বন্ধ করেন, আর তা নাহলে তাদের প্রাণ যাবে। কয়েকটা ঘটনায়, আক্রমণকারীরা ইচ্ছা করে সাংবাদিকদের পঙ্গু করে দেয় যাতে তারা আর কলম ধরতে না পারেন।

শয়ে শয়ে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন, যার পর কখনো কখনো আক্রমণও ঘটেছে, যারফলে তারা মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন।[16] কমপক্ষে আটজন মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ২০০০ সাল থেকে এপর্যন্ত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

বেঁচে থাকার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের পূর্ণ তদন্ত করার জন্য রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা থাকলেও, পুলিশ সাধারণতঃ ঐধরণের তদন্ত চালাতে ব্যর্থ হয়েছে।[17]

4. শাস্তিবিহীনতা, দুর্বল প্রতিষ্ঠান এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠি ও ব্যক্তিদের ওগুলিকে নিজেদের কাজে লাগানো

বাংলাদেশের সব সরকারই প্রশাসনের সবস্তরে জবাবদিহিতা ও কর্মদক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সম্প্রদায় সাধারণভাবে একমত যে দুর্বল শাসন, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানের রক্ষাকবচগুলিসহ আইনের শাসনকে গুরুতরভাবে খাটো করেছে।

---

[16] রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স-এর বিবরণ অনুসারে, কেবলমাত্র ২০০৩ সালেই, ২০০-র বেশী সাংবাদিককে রাজনৈতিক কর্মী, অপরাধী গুন্ডাদল কিংবা ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে হয়েছে। দেখুন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স ৩-রা মে ২০০৪, বাংলাদেশ – ২০০৪ বার্ষিক রিপোর্ট,
http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=10150&Valider=OK (visited 2 June 2004, 15:30 GMT)

[17] যেমন ধরুন, আইসিসিপিআর –এর ধারা ৬.১-এ বলা আছেঃ " কাউকে ইচ্ছামতো জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না ", এর সাথে আরো বলা হয়েছে যে হিউম্যান রাইটস কমিটি, যে সংস্থা আইসিসিপআর-এর অধীনে গঠিত হয়েছে এই চার্টার বা সনদের বাস্তবায়নের উপর নজরদারি করার জন্য , তারা মন্তব্য করেছে যে " রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলিকে পদক্ষেপ নিতে হবে .... ফৌজদারি অপরাধের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাণহানি নিবারণ ও তার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য। {Reference: General Comment No. 6 on Article 6 (Right to life) (Sixteenth session (1982), paragraph 3.) }

বর্তমান সরকার সাধারণভাবে তাদের পদক্ষেপের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে তাদের ক্ষমতায় আসার প্রথম দুইবছর, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে, এই অজুহাতে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরূদ্ধে আক্রমণের ঘটনাগুলি কিম্বা দেশে উগ্রবাদী গোষ্ঠিগুলির উপস্থিতির কথা প্রচারের মাধ্যমে, ওরা দেশের ভাবমূর্তি বিদেশে "নষ্ট" করেছেন। একজন বাংলাদেশী মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেনঃ

> "এটা পরিহাসের ব্যাপার যখন আমাদের ভাবমূর্তি হচ্ছে এমন এক দেশের যেখানে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় দুর্নীতি আছে এবং যেখানে দাতা দেশগুলি অনবরত বলছে যে বাংলাদেশের শাসন পরিচালনার রেকর্ড দুর্বল।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জানামতে, পর্যায়ক্রমে সরকারগুলি তাদের নিজেদের সমর্থক বা তাদের জোটের দলগুলির সমর্থকদের মানবাধিকার অনাচার-অত্যাচারকে নিয়মিতভাবে অগ্রাহ্য করেছে, যার ফলে ওরা ঐধরণের কাজের জন্য শাস্তি পায়নি। একইসময়ে, একটা স্বল্প-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বাহ্যতঃ দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ বাহিনি এবং অতিরিক্ত কাজের ভারগ্রস্ত বিচার-ব্যবস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের, কিংবা তাদের রক্ষাকারীদের, বিচারের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে।

টিপু সুলতান তার নির্যাতনের সময়কার জখম দেখাচ্ছেন

l©Private

এছাড়া, দেশের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরালো করতে সরকার ও বিরোধীপক্ষের একটা গঠনমূলক সংলাপে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে গোষ্ঠিগত ব্যর্থতা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরূদ্ধে রক্ষাকবচগুলির আরো ক্ষতি করেছে। একদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিচার করতে ব্যর্থতা, শাস্তিবিহীনতা অবসানের ক্ষেত্রে একটা পরোক্ষ আগ্রহের অভাব, কিছু কিছু ক্ষেত্রে , উদাহরণস্বরূপ, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সরকারের ত্রুটির সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায়, সরকার বস্তুতঃ শাস্তিবিহীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এর ফলে, দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজগুলির জন্য শাস্তিবিহীন একটা পরিবেশ বিরাজ করেছে।[18]

5. উপযুক্ত সতর্কতা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত মান এবং বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সংঘটিত কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। এই রিপোর্টে উল্লেখিত কতগুলি লঙ্ঘন পুলিশ, অন্যান্য আইন বলবৎকারী কর্মচারী এবং সময়ে সময়ে, সরকারী কর্মচারীদের উস্কানীতেও হয়েছে বলে জানা যায়।

[18] মানবাধিকার রক্ষাকর্মী সলিম সামাদকে ২০০২ সালে গ্রেফতার এবং শাহরিয়ার কবিরকে একবার ২০০১ সালের শেষদিকে আর ২০০২ সালের শেষদিকে গ্রেফতার কর্তৃপক্ষের উস্কানিতে ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজ ছিলো।

অন্যান্য মানবাধিকার অনাচার-অত্যাচার করেছে “ রাষ্ট্রযন্ত্র-বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থারা ”, যারজন্য আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে, সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য, যেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা ঐ অনাচার-অত্যাচার নিবারণ, তদন্ত কিংবা তার প্রতিকার করার চেষ্টায় অবহেলা দেখিয়েছে।

এ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল “রাষ্ট্রযন্ত্র-বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থা” শব্দ ব্যবহার করে সেইসব লোকজন ও সংস্থাকে বোঝানোর জন্য যারা কাজ করে রাষ্ট্র, তার অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ও তার প্রতিনিধিদের বহির্ভূতভাবে। "রাষ্ট্রযন্ত্র-বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থার" কাজগুলির জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুরু হয় যখন সরকার বিভিন্ন অধিকারের সুরক্ষা, বিকাশ ও পূরনের জন্য উপযুক্ত সতর্কতা পালনে তার আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। একটি রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রযন্ত্র-বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থার কাজকর্মের জন্য দায়ী বলে বিবেচনা করা হতে পারে , তাদের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট ধরণের সম্পর্কের কারণে, কিংবা কোন অনাচার-অত্যাচার নিবারণ বা সাড়া দিতে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিতে তার ব্যর্থতার জন্য। এর মধ্যে থাকতে পারে অনাচার-অত্যাচার নিবারণ বা নির্মূল করতে ব্যর্থতা, অনাচার-অত্যাচার তদন্তে ব্যর্থতা, কোন মানবাধিকার অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থার অভাব, কিংবা ভুক্তভোগী বা তাদের পরিবারদের জন্য প্রতিকার করতে কিংবা ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যর্থতা। “রাষ্ট্রযন্ত্র-বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থাগুলি” যেসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করে তার সবক্ষেত্রেই, বাংলাদেশ সরকার আক্রমণকারীদের বিচার করতে সামান্যই সঙ্কল্প দেখিয়েছে। হুমকি ও দৈহিক আক্রমণের শিকার ব্যক্তিদের কোন সুরক্ষা থাকে না। সন্দেহভাজন সংঘটনকারীদের ব্যাপারে খুব কম ক্ষেত্রেই তদন্ত করা হয়েছে। তাদের অনেকে পুলিশকে ঘুষ দিয়েছে বলে জানা যায়, যাতে তাদের ঐ আক্রমণগুলির মামলায় জড়িত না করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে, সংঘটনকারীরা ঐসব রাজনীতিকের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার উপর নির্ভর করে যারা তাদের রক্ষা করতে সক্ষম।

সুমি খান

©Private

বাংলাদেশে, কয়েকজন সাংবাদিক এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন সরকারের সাধারণভাবে একটা নিষ্ক্রিয়তার মনোভাবের কথা। তাদের মতে আক্রমণগুলির প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ একটা প্যাটার্ন অনুসরন করেছেঃ যেসব ক্ষেত্রে প্রকাশ্য হৈ চৈ হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা আক্রমনের স্থান পরিদর্শন করেন, অথবা হাসপাতাল যেখানে ভুক্তভোগীর চিকিৎসা হয়, কিংবা তাদের বাড়ীতে যান, যেখানে তারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার এবং ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু প্রায়ই ঐ প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হন।

অনেক ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারদেরই কাজ হয় – অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের নৈতিক সমর্থনের সহায়তায় – ঐ আক্রমণগুলির একটা বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত, অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার, এবং নতুন করে প্রাণনাশের হুমকি থেকে তাদের সুরক্ষার জন্য দাবী করতে থাকা। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, বিশেষ করে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে চুক্তি – এই দুটোতেই বাংলাদেশ স্বাক্ষরদাতা দেশ। এগুলির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির একটা বাধ্যবাধকতা আছে, দ্রুততার সাথে, কার্যকরভাবে এবং পক্ষপাতবিহীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির তদন্ত করা এবং ভুক্তভোগীদের জন্য কার্যকর প্রতিকার বিধান করা। বাংলাদেশে, এই বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থতায় বিচার পদ্ধতির প্রতি আস্থা হ্রাস পেয়েছে, এবং অনেক ভুক্তভোগী বিচার-বিভাগীয় প্রতিকার খুঁজতে চাননি।

কোন কোন ক্ষেত্রে , মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরূদ্ধে আক্রমণের তদন্ত হয়েছে এবং খুব অল্প ক্ষেত্রেই অপরাধীদের বিচারের জন্য একটা বিচার-বিভাগীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে, এসব হয়েছে এমন ক্ষেত্রে, যার আগে ন্যায়বিচারের জন্য সাংবাদিক সমিতি ও মানবাধিকার গোষ্ঠিরা মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন চালিয়েছেন এবং উকিলরা ও অন্যান্যরা অব্যাহতভাবে দাবী করেছেন। এমনকি তদন্ত শুরু হওয়ার পরেও, সেগুলির গতি খুব ধীর ছিলো, যাতে করে এই সন্দেহই সৃষ্টি হয় যে , কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করে বিচারের পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছে।

শামসুর রহমান, দৈনিক জনকন্ঠের একজন সাংবাদিক ও বিবিসি বাংলা সার্ভিসের একজন সম্প্রচারকারীকে, ১৬ই জুলাই ২০০০-এ পশ্চিমের যশোর শহরে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ মামলা এখনো কোন কোর্টে শুনানীর জন্য যায়নি, জানা গেছে এই কারণে যে, প্রাথমিক পুলিশী তদন্তের রিপোর্ট যা বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় এবং যাতে ১৬জন ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন বলে চিহ্নিত করা হয়, সেটা জুলাই ২০০১-এ বাতিল করা হয় অস্থায়ী সরকারের আমলে। যখন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন ভুক্তভোগীর পরিবার ও মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের আপত্তি সত্ত্বেও মামলাটা আবার শুরু করা হয়, যদিও তাদের বিশ্বাস ছিলো যে প্রাথমিক তদন্তে অপরাধীদের ঠিকই সনাক্ত করা হয়েছিলো।

টিপু সুলতানের মামলার অগ্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে, যার মধ্য দিয়ে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসে। সাধারণভাবে, বাংলাদেশের নতুন সরকার পুরনো ফৌজদারি অপরাধের মামলাগুলির তদন্ত করতে আগ্রহী থাকে যেক্ষেত্রে সাবেক সরকারের রাজনীতিকদের জড়িত করা হয়েছে। টিপু সুলতানের ক্ষেত্রে, বর্তমান সরকারের প্রাথমিক নিস্পৃহার কারণ ধারণা করা হয় যে টিপু সুলতানের আক্রমণে জড়িত বলে অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন রাজনৈতিক আনুগত্য বদল করেছিলো। তবে যাই হোক, ২০০১ সালের শেষদিকে একটা তদন্ত শুরু হয় এবং পরবর্তীতে কোর্টে একটা চার্জশীট পাঠানো হয়, যার মধ্যে ১৩ ব্যক্তিকে ঐ আক্রমণের জন্য দায়ী বলা হয়। এরপরে শিগগিরই স্পষ্ট হয় যে, তদন্তের মধ্যে এমন নিয়মানুবর্তিতা পালন করা হয়নি যাতে করে অভিযোগগুলি কোর্টে গিয়ে টেঁকেনি। এর ফলে, হাই কোর্ট অভিযুক্তদের এক দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মামলা মুলতবি করে দেয়, যাতে বলা হয়েছিলো সরকারী কৌঁশুলীরা তাদের বিরূদ্ধে অভিযোগের যথার্থতা পেশ করেনি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ঐ স্থগিতাদেশকে এ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস চ্যালেঞ্জ করেনি, কার্যতঃ মামলাটা পড়ে থাকে এবং সংঘটনকারীরা শাস্তিবিহীন পরিস্থিতি ভোগ করতে থাকে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পাওয়া তথ্যমতে, এই রিপোর্টে উল্লেখিত, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরূদ্ধে আক্রমণের জন্য কাউকেই এপর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়নি।

সময়ে সময়ে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে ছিলো তা কোর্টের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। প্রবীর শিকদার, একজন সাংবাদিক যিনি এপ্রিল ২০০১-এ এক আক্রমনে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন, তিনি একটা আইনের আশ্রয় নেন যার আওতায় অভিযোগকারীরা কোর্টে পুলিশের দাখিল-করা চার্জশীটের মধ্যেকার ক্রটি-বিচ্যুতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। তিনি এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেন যে তার পরিবার কোর্টের কাছে পর পর তিনটি দরখাস্ত দাখিল করে, যার মধ্যে অনুরোধ করা হয় যে পুলিশের কাছে তিনি যে সন্দেহভাজনদের নাম দিয়েছিলেন, সেগুলি যেন চার্জশীটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু তা সফল হয়নি।

প্রতিশোধের ভয় এবং সাংবাদিকদের বিরূদ্ধে আক্রমনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করার ব্যাপারে সরকারের প্রতি আস্থার অভাবকে প্রায়সময়েই আক্রমণে রক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পুলিশের বিরূদ্ধে অভিযোগ দাখিল করতে নিস্পৃহতার কারণ বলে তারা উল্লেখ করেন। তাদের ভয় ও হতাশা বোঝা কঠিন নয়। মানিক চন্দ্র সাহা, খুলনার একজন প্রবীন সাংবাদিক, যিনি *নিউ এজ* দৈনিক ইংরেজী পত্রিকার স্থানীয় অফিসের প্রধান, বাংলা দৈনিক *দৈনিক সংবাদের* সংবাদদাতা এবং বিবিসি বাংলা বিভাগের স্ট্রিংগার বা সংবাদদাতা ছিলেন, তাকে ১৫ই জানুয়ারী ২০০৪-এ খুলনা প্রেস ক্লাব থেকে তার বাড়ীতে যাওয়ার পথে হত্যা করা হয়। তিনি যে তিন-চাকার রিকশায় চড়ে যাচ্ছিলেন অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা তা থামিয়ে তার মাথার উপর একটা দেশী বোমা ছুঁড়ে দেয়। তার হত্যাকান্ড বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। সহযোগী সাংবাদিকেরা বিশ্বাস করেন যে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিলো

মাওবাদী গোষ্ঠিগুলি ও স্থানীয় অপরাধী গুন্ডাদলের বে-আইনী তৎপরতা সম্বন্ধে *দৈনিক সংবাদ* এবং বিবিসির সম্প্রচারে দেওয়া তার অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টগুলির কারণে। ঐ আক্রমণের আগে তিনি কয়েক দফা হত্যার হুমকি পেয়েছিলেন। জানা যায় যে, ২২-শে জানুয়ারী ২০০৪-এ, নিষিদ্ধঘোষিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ)-এর নেতা, সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনিই মানিক সাহার হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী। ঐ চিঠিতে তিনি আরো নয়জন স্থানীয় সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দেন, যদি তারা মানিক সাহার হত্যাকান্ড সম্বন্ধে লেখা বন্ধ না করেন। জানা যায় যে, তিনি ঐ চিঠিতে নাম সই করেছিলেনঃ "গাফফার ডাকনাম তুষার, সাতক্ষীরা কমান্ডার, জনযুদ্ধ" এবং ঐ চিঠিতে নিম্নলিখিত হুমকি দেওয়া হয়েছিলোঃ " আমি গাফফার (ও) আমার দলীয় ডাকনাম তুষার [এবং] আমি মানিক সাহাকে হত্যা করেছি। এখন আমার দলের গেরিলারা প্রকাশ্য দিনের বেলায় আপনাদের বোমা ছুঁড়ে হত্যা করবে।"[19] পুলিশ ঘোষণা দেয় যে তারা জুলাই মাসের গোড়া থেকেই ঐ হত্যাকান্ডের তদন্ত করছে, আর একটা চার্জশীট কোর্টে পাঠানো হয়েছে। তাতে ঐ হত্যাকান্ড চালানোর জন্য ঐ নিষিদ্ধঘোষিত গোষ্ঠির ১২জন সদস্যের নাম করা হয় । তবে, খুলনায় সহযোগী সাংবাদিকেরা তাদের দাবীতে অটল থাকেন যে ঐ চার্জশীটে ঐ হত্যাকান্ডের নেপথ্যে-থাকা মূল পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করা হয়নি।

বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অব্যাহত অসহায়তার প্রধান কারণ সাংবাদিকদের বিরূদ্ধে হামলার বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকর তদন্ত এবং তার পরবর্তীতে মামলা করার ব্যাপারে সরকারের সঙ্কল্পের অভাব। হুমায়ুন কবির বালু, বাংলা পত্রিকা, *দৈনিক জন্মভূমি*-র সম্পাদক, ২৭-শে জুন ২০০৪-এ এক বোমাহামলায় প্রাণ হারান। তিনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও খুলনা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জানা যায় যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে তৎপর নিষিদ্ধঘোষিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধ দলছুট গোষ্ঠি ঐ আক্রমণের জন্য দায়িত্ব দাবী করেছিলো। সাক্ষীরা সাংবাদিকদের বলেন যে এক যুবক চীনাবাদামওয়ালা সেজে বালুর গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসে, যখন সেটা তার বাড়ীর সামনে থামছিলো, তারপর সে তার চীনাবাদামের ঝুড়ি থেকে অন্ততঃ দুটো বোমা বের করে বালুর দিকে ছুঁড়ে দেয়, যারফলে সাথে সাথে তিনি প্রাণ হারান এবং তার বড়ছেলে আহত হয়, যে তার ভাই ও বোনসহ ঐ গাড়ীতে ছিলো। জানা যায় যে, বালু ঐ নিষিদ্ধঘোষিত দলের কাছ থেকে কয়েকবার হত্যার হুমকি পেয়েছিলেন। ঐ দলটির নৃশংস তৎপরতার খবর প্রায়ই স্থানীয় ঐ বহুল-প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হতো যার সংবাদদাতা হিসাবে তিনি কাজ করতেন।

বালুর হত্যাকান্ড সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও তাদের বিরূদ্ধে আক্রমণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করার ব্যাপারে সরকারের দৃঢ়সঙ্কল্পের অভাব সম্পর্কে দেশে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ আবারো তুলে ধরলো। সাংবাদিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা ঐধরণের আক্রমণ থেকে সাংবাদিকদের রক্ষা করার জন্য এবং আক্রমণকারীদের বিরূদ্ধে মামলা করার জন্য সরকারের উপর তাদের চাপ অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা আরো জোরালো করে। মানিক সাহার হত্যাকান্ডের স্মৃতি (উপরে দেখুন) এবং তার গুপ্তহত্যায় জড়িতদের একটা পূর্ণ ও স্বচ্ছ তদন্তের মধ্য দিয়ে বিচারের আওতায় আনতে সরকারের ব্যর্থতা, সবার মনেই অত্যন্ত তাজা ছিলো। মানিক সাহার হত্যাকান্ডের একটা পূর্ণ তদন্তের জন্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে হুমায়ুন কবির বালু একজন সবচেয়ে দৃঢ়সঙ্কলবদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

সমস্ত বহুল-প্রচারিত মামলার ক্ষেত্রে যা ঘটে, বালুর হত্যাকান্ডের পরবর্তী দিনগুলিতে, সরকারী কর্মকর্তারা ঐ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন এবং নিন্দা করেন। তবে, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা কর্তৃপক্ষের ঐ প্রতিশ্রুতিতে তাদের আস্থার অভাব অব্যাহতভাবে প্রকাশ করতে থাকেন যে একটা বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

ডেইলি স্টার পত্রিকায় এক মতামত জরীপে ঐ সমস্যার ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়।

---

[19] ডেইলি স্টার, 'দস্যুরা সাতক্ষীরার ৯ জন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দিয়েছে ', 23 জানুয়ারী 2004. আরো দেখুনঃ CPJ, 22 January 2004, http://www.cpj.org/cases04/asia_cases04/bangla.html, (visited 26 May 2004); and RSF, http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=9079 (visited 26 May 2004).

শওকত মিলটন, একজন সাংবাদিক যিনি প্রাণনাশের হুমকির লক্ষ্যবস্তু।
©Private

"প্রশাসনের মধ্যে আস্থার অনুপ্রেরণা সৃষ্টির বদলে, এসব পদক্ষেপ ও আশ্বাস যেগুলি বেশীর ভাগ ফাঁকা বলে মনে হয়, তাতে করে মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ বাড়িয়েছে। সাংবাদিকদের একের পর এক হত্যাকান্ডের সংঘটনকারীদের অভিযুক্ত করতে প্রশাসনের নির্লজ্জ ব্যর্থতা সাংবাদিক সম্প্রদায়কে দারুণ হতাশায় ফেলে দিয়েছে এবং তাদের অনেকেই এই বিপজ্জনক পেশা ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে চাপের সম্মুখীন। সরকার যদি এই গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা যোগানোর উদ্দেশ্যে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গুরুতর পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।"[20]

এই ব্যর্থতার সবচেয়ে দারুণ উদ্ঘাটনমূলক স্বীকারোক্তি ২-রা এপ্রিল ২০০৫-এ ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে থেকে আসে খুলনায় তার এক বিরল সফরের সময়ে। তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেনঃ

"আমার খুলনা সফরের উদ্দেশ্য হলো সাংবাদিক হুমায়ুন কবির আর বেলালউদ্দিনের হত্যাকান্ডের তদন্তের অগ্রগতি সার্বিকভাবে দেখা এবং এর উপর নজরদারি করা...কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নজরদারি সেল এদুটো হত্যাকান্ডের তদন্তের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয় (sic)"।[21]

দেখা যায় যে জনসাধারণেকে আশ্বস্ত করার এই জরুরীভাববোধ যে, ঐ হত্যাকান্ডগুলির আরো বিশ্বাসযাগ্য তদন্ত করা হতে যাচ্ছে, তা খুলনায় আরো একজন সাংবাদিক – শেখ বেলালউদ্দিন আহমদ, *দৈনিক সংগ্রাম*-এর খুলনা ব্যুরো চিফ-এর উপর আক্রমণের ফলে হয়েছে। তিনি ১১-ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫-এ ঢাকার কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে মারা যান। তাকে ৫-ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫-এ আক্রমণ করা হয়, যখন তিনি খুলনা প্রেস ক্লাবের সামনে একটা মোটরবাইকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাতে রাখা একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঐ বিস্ফোরণের ফলে বেলালউদ্দিন গুরুতর ও মারাত্মকভাবে আহত হন। বেলালউদ্দিনের সঙ্গে যে আরো তিনজন সাংবাদিক ছিলেন তারা বিভিন্ন মাত্রায় আহত হন। বিশিষ্ট সাংবাদিক শেখ বেলালউদ্দিন, ইসলামী দল, জামায়াত-ই-ইসলামীর সদস্য ছিলেন, যা শাসক জোটের মধ্যে দ্বিতীয় বড় দল। বাংলাদেশের মানবাধিকার সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, তার হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পূর্ণ তদন্তের জন্য জামায়াত-ই-ইসলামীর পক্ষ থেকে চাপের ফলে কর্তৃপক্ষকে ঐভাবে আশ্বাসগুলি দিতে হয়।

এই দুটো কেসের চার্জশীট (বালু ও বেলাল) ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের ঐ বিবৃতির পরবর্তীতে কোর্টে দাখিল করা হয়। বালুর কেসের শুনানী জুন ২০০৫-এ শুরু হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু খুলনার সাংবাদিকেরা আবারো ঐ চার্জশীটের বিষয়বস্তুতে আপত্তি জানায় এই বলে যে, ওতে ত্রুটি আছে। একটি যুক্ত বিবৃতিতে, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং খুলনা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা দাবী করেন যে যারা ঐ আক্রমণের উদ্যোক্তা তাদের চিহ্নিত করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে।

"আমরা এই দুটো হত্যাকান্ডের ব্যাপারে [একটা] পুনরায় তদন্ত দাবী করছি যাতে হত্যাকারী ও তাদের মূল পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করা যায়। পুনরায় তদন্তের পর এই হত্যাকান্ডের মতলবের উদ্দেশ্যও

[20] ডেইলি স্টার, 'পয়েন্ট-কাউন্টার পয়েন্ট', 13 জুলাই 2004

[21] ডেইলি স্টার, 'টপ প্রায়োরিটি টু জার্নালিস্টস মার্ডার কেস, সেইস আইজিপি', 3 এপ্রিল 2005.

চার্জশীটে সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।”[22]

6. আইনগত কাঠামো

মানবাধিকার রক্ষাকর্মী – সেইসাথে যেকোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠির – সুরক্ষার অধিকারের আইনগত কাঠামোর মধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষার মান অন্তর্ভুক্ত যাতে বাংলাদেশ এক রাষ্ট্রপক্ষ। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর - ICCPR), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিইএসসিআর- ICESCR), নারীদের বিরূদ্ধে সবরকম বৈষম্য নির্মূল সংক্রান্ত চুক্তি (সিইডিএডাব্লিউ – CEDAW), শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (সিআরসি - CRC), শিশুদের সশস্ত্র বিরোধে জড়িত করার ব্যাপারে সিআরসি (CRC)-তে ঐচ্ছিক প্রোটোকল, সবধরণের বর্নবৈষম্য নির্মূলের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি, এবং নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অপমানকর ব্যবহার বা শাস্তির বিরূদ্ধে চুক্তি।

এর অতিরিক্তভাবে, মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সংক্রান্ত ঘোষণায় পুনরায় বলা হয়েছে যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষার জন্য রক্ষাকবচগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে। ঐ ঘোষণার নিম্নলিখিত ধারাগুলি বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

এই ঘোষণার ধারা ১-এ বলা আছেঃ
“জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, প্রত্যেকেরই, ব্যক্তিগতভাবে ও অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা বাস্তবায়ন ও সুরক্ষার অধিকার আছে।”

এই ঘোষণার ধারা ৯.১-এ বলা আছেঃ
“মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, যারমধ্যে মানবাধিকারের বিকাশ ও সুরক্ষাসহ, যার উল্লেখ বর্তমান ঘোষণায় করা আছে, তাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে, ব্যক্তিগতভাবে, এবং অন্যদের সাথে মিলিতভাবে, একটা কার্যকর প্রতিকারের সুবিধা পাওয়ার এবং ঐসব অধিকার লঙ্ঘন হলে তা থেকে সুরক্ষার অধিকার।”

এই ঘোষণার ধারা ১২-তে বলা আছেঃ

“1. প্রত্যেকের অধিকার আছে , ব্যক্তিগতভাবে ও অন্যদের সাথে মিলিতভাবে, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার লঙ্ঘনের বিরূদ্ধে শান্তিপূর্ণ তৎপরতায় অংশ নেওয়ার।

2. বর্তমান ঘোষণায় উল্লেখিত অধিকারগুলির প্রয়োগের কারণে যেকোন সহিংসতা, হুমকি, প্রতিশোধ, তথ্যগত (*de facto* বা আইনগত (*de jure)* প্রতিকূল বৈষম্য, চাপ বা যেকোন ধরণের ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপের বিরূদ্ধে প্রত্যেকের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য,ব্যক্তিগতভাবে ও অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে, রাষ্ট্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

3. এই সূত্রে, প্রত্যেকের অধিকার আছে, ব্যক্তিগতভাবে ও অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে, দেশের আইনের আওতায় কার্যকরভাবে সুরক্ষা পাওয়ার , যখন তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে, প্রতিক্রিয়া বা বিরোধিতা করবেন, কোন তৎপরতা ও পদক্ষেপের, যারমধ্যে রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা বলে যাকে ধরা যায় , যারফলে মানবাধিকার ও

[22] ডেইলি স্টার, ‘খুলনা জুর্নোস রিজেক্ট বোথ চার্জশীটস্’, 28 এপ্রিল 2005.

মৌলিক স্বাধীনতার লঙ্ঘন হয়, এবং সেইসাথে বিভিন্ন সহিংসতার কাজ যেগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠি বা ব্যক্তি করেন, যা মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের উপর প্রভাব ফেলে।”

রানা দাশগুপ্ত, চট্টগ্রামের আইনজীবি ও মানবাধিকার রক্ষাকর্মী।

©Private

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩য় অংশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা যে ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্মুখীন হন তার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ যোগানো আছে। ওগুলির ৩য় অংশে অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে যে কোন আইন যদি ৩য় অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বলা মৌলিক অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় ,তাহলে তা বাতিল গণ্য হবে। [23]

সংবিধানের ৩য় অংশে, যে নিশ্চয়তা দেওয়া আছে সেগুলি হলোঃ আইনের চোখে সবাই সমান, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারীপুরুষ, কিংবা জন্মস্থান, সরকারী চাকরীতে সবার সমান সুযোগ, আইনের অধীনে সুরক্ষা, বাঁচার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ, চলাফেরা, সমাবেশ, সমিতি, চিন্তা, বিবেক, আর কথা বলা, সংবাপদপত্রের স্বাধীনতা, পেশা বা চাকরির স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, এবং বাড়ীঘরের ও চিঠি লেখার জন্য সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার সবার আছে।

এছাড়া, সংবিধানের ধারা ৪৪-এ বলা আছে যে ধারা ১০২-এর উপধারা ১ অনুসারে হাই কোর্ট ডিভিশনের কাছে যাওয়ার অধিকার এই [৩য়] অংশের মধ্যে দেওয়া অধিকার বলবৎ করার জন্য, নিশ্চিত করা আছে।” [24]

7. এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সুপারিশগুলি

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

7.1 *আইন বলবৎকারী কর্মচারীরা যে ইচ্ছামতো গ্রেফতার, ইচ্ছামতো আটক ও নির্যাতনসহ বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেন সেবিষয়ে*

- মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটা প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া। মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সকল আইন বলবৎকারী কর্মচারীকে, সকল পর্যায়ে, তাদের বাধ্যবাধকতা জানানো , এবং সুস্পষ্ট করে দেওয়া যে তাদের সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে;

23 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৬.১ ধারা

24 সংবিধানের ১০২ ধারা হাইকোর্টের কাছে বিচারবিভাগীয় প্রতিকার চাওয়ার জন্য আইনজীবিরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন যখন কোন মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে। এতে “প্রজাতন্ত্রের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন কাজকর্ম করছেন এমন কোন ব্যক্তির” সংঘটিত বে-আইনী কাজকর্মের জন্য (নির্যাতনসহ) রক্ষাকবচের বিধান আছে; একজন আটক ব্যক্তিকে কোর্টের সামনে হাজির করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে “তাকে বৈধ কর্তৃত্ব ছাড়া কিংবা বে-আইনীভাবে হেপাজতে রাখা হচ্ছে”ঃ এবং কর্মচারীদের দেখাতে বাধ্য করা যে তারা কোন আইনগত কর্তৃত্বের অধীনে একজন ব্যক্তিকে আটক রাখছেন।

- একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করা ,এই রিপোর্টে উল্লেখিত কেসগুলি পরীক্ষার জন্য, এই চিন্তা মনে রেখে যাতেঃ ভুক্তভোগীরা বিচার ও প্রতিকার পায়; ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ঐ ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা যায়, যার ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলি ঘটেছে; এবং আইন, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে পরিবর্তনের সুপারিশ করা এটা নিশ্চিত করার জন্য যাতে আইন বলবৎকারী কর্মচারীরা তাদের আচরণ-সংক্রান্ত আইন ও আন্তর্জাতিক মান পালন করেন।
- নিশ্চিত করা যাতে ম্যাজিস্ট্রেটরা কঠোরভাবে বে-আইনীভাবে আটক রাখার বিরূদ্ধে রক্ষাকবচগুলি পালন করেন, যখন কোন বন্দীকে পুলিশের হেপাজতে রাখার আদেশ দেন; এবং সেই উদ্দেশ্যে, নিশ্চিত করেন যেন বন্দীদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সশরীরে হাজির করা হয় এবং নিশ্চিত করেন যেন ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্যাতনের চিহ্ন বা অভিযোগ অগ্রাহ্য না করেন যখন পুলিশ বন্দীদের হেপাজতে রাখার জন্য অনুরোধ করে;
- একজন স্বাধীন ও যোগ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সকল ইচ্ছামতো গ্রেফতার, ইচ্ছামতো আটক আর নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা অপমানকর ব্যবহার বা শাস্তিদান সম্পর্কে অভিযোগের দ্রুত ও পূঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত নিশ্চিত করা;
- নিশ্চিত করা যাতে সন্দেহভাজন মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার মান অনুসারে পদ্ধতির মাধ্যমে বিচার করা হয়;
- পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের প্রতিকার যোগানো।

7.2 রাষ্ট্রযন্ত্রের বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থাগুলি যে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের প্রাণনাশের হুমকি, আক্রমণ আর গুপ্তহত্যা চালান সেবিষয়ে

- নিশ্চিত করা যাতে প্রাণনাশের সকল হুমকি, আক্রমণ ও গুপ্তহত্যার ঘটনা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্রুত আর পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হয় এবং সন্দেহভাজন সংঘটনকারীদের বিচার করা হয়;
- নিশ্চিত করা যাতে যারা হুমকি ও আক্রমণের শিকার হয়েছেন, তাদের পরিবার, ও সাক্ষীদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার চাওয়ার প্রচেষ্টায় তারা ঐ ধরণের অনাচার-অত্যাচার থেকে পূর্ণ সুরক্ষা পান;
- নিশ্চিত করা যাতে আইন বলবৎকারী কর্মচারীরা কোন প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই কোর্টের কাছে অনাচার-অত্যাচারকারীদের বিরূদ্ধে যাতে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করতে পারেন তার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা পান;
- নিশ্চিত করা যাতে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার যে কোন কর্মচারী, যাদের ঘুষ বা অবহেলার মাধ্যমে সংঘটনকারীদের সঙ্গে আঁতাত করার জন্য সন্দেহ করা হয়, তাকে বিচারের আওতায় আনা এবং ন্যায্য বিচার করা;
- রাষ্ট্রযন্ত্র-বহির্ভূত ব্যক্তি/সংস্থার মানবাধিকার অনাচার-অত্যাচারের ভুক্তভোগীদের, ক্ষতিপূরণসহ প্রতিকার বিধান করা।

7.3 মানবাধিকার সুরক্ষার রক্ষাকবচগুলি জোরদার করার বিষয়ে

- দীর্ঘপ্রতীক্ষিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্থাপন করা;
- ন্যায়পালের (ওম্বুডসম্যান) দফতর স্থাপন করা;
- বিচার-বিভাগকে কার্যনির্বাহী থেকে আলাদা করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা;

7.4 শাসক জোটের সদস্যদের সংঘটিত অনাচার অত্যাচারের বিষয়ে

- নিশ্চিত করা যাতে শাসক জোটের, কিংবা তাদের মিত্র দলের সদস্যদের সংঘটিত মানবাধিকার অনাচার-অত্যাচারের সকল অভিযোগ, একটি স্বাধীন ও যোগ্য কর্তৃপক্ষ দ্রুত তদন্ত করে, এবং যারা দায়ী সাব্যস্ত হবেন

তাদের এসব দলে অবস্থান যাই হোক না কেন, কিংবা সরকারের সাথে যাই যোগসূত্র থাকুক না কেন, তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে।

7.5 *সকল রাজনৈতিক দলের জন্য সুপারিশ*

- মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য সরকারের যেকোন উদ্যোগকে সহায়তা দিন;
- নিশ্চিত করুন যাতে আপনার দলের কোন সদস্য, যার বিরূদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট আছে ,তাকে রক্ষা করার জন্য আপনার দল কোন সহায়তা না দেয়।

7.6 *আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সুপারিশ*

- মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উদ্বেগ বাংলাদেশ সরকারের সাথে আপনাদের দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বৈঠকের সময়ে তুলে ধরুন;
- সরকারকে অনুরোধ করুন যাতে তারা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরূদ্ধে লঙ্ঘনকারীদের বিচারের আওতায় আনে।

7.7 *প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের প্রতি সুপারিশ*

- বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ তুলে ধরুন;
- বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করুন যাতে তারা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা দেয় এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিরূদ্ধে লঙ্ঘনকারীদের বিচারের আওতায় আনে।